প্রথম আলো

তারিখ 24 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম

সংবাদ বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তায়নের ছায়া

কামাল আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, বিশেষভাবে ধন্যবাদ ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে। ধন্যবাদ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং প্রতিবাদ নাকচ করে দিয়ে কতিপয় অসাধু কিন্তু ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। অস্বাভাবিক দ্রুততায় ঘ ইউনিটের বিতর্কিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করার কৃতিত্বও তো কম কিছু নয়।

ফাঁস হওয়া প্রশ্ন কিনে যেসব ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পঠন-পাঠনের সুযোগ করে নিয়েছেন, তাঁদেরও অভিনন্দন। নীতি-নৈতিকতা বিসর্জনের অনুশীলনটা আপনাদের ভালোই হবে। কেননা, প্রমাণিত হয়েছে দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং তাঁর প্রশাসন অপরাধকে প্রশ্রয় দিতে কসুর করেন না। কয়েক বছর ধরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে অধঃপতনের ধারা অনুসৃত হচ্ছে, তাঁরা তাকে আঁকড়ে থাকতে চান। পরীক্ষাপদ্ধতির দূষণ প্রতিরোধ বা প্রতিকারের ন্যূনতম ইচ্ছাও তাঁদের নেই।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তায়নের ছায়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তাকে অস্বীকারের ঘটনা যখন এ দেশে একটি নৈমিত্তিক (রুটিন) বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন ব্যতিক্রম হবে? মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এমনকি শিক্ষামন্ত্রীও তা অস্বীকার করেন। চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, চাকরিদাতা কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয় যে প্রতিষ্ঠানটির কর্তাব্যক্তি তা স্বীকার করে নেবেন!

তার চেয়ে বরং ৭১ হাজার ৫৯৮ জনের উত্তরপত্রের মূল্যায়ন এবং তার ফলাফল তৈরি করে প্রকাশের কাজটি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করতে পারার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানো যাক। তাঁকে আরও অভিনন্দন জানানো যায় এ কারণে যে, তিনি এক অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। ওই তত্ত্ব বলছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করা হচ্ছে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর, আগে তো করা হয়নি। কয়েকজন সাংবাদিক অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে পরীক্ষা হওয়ার আগে তো ফাঁস হওয়া প্রশ্নগুলো মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। এসব শিক্ষানবিশ সাংবাদিক (বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা) জানেন না যে শিক্ষক রাজনীতির (দলীয়) সুবাদে উপাচার্যের দায়িত্ব পাওয়া ব্যক্তির জন্য প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থতা তাঁর ভবিষ্যতের জন্য ভালো না-ও হতে পারে। সুতরাং, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কথা স্বীকার করার মতো নির্বুদ্ধিতার পথে তিনি কেন হাঁটবেন?

বাস্তবে অবশ্য জানা যাচ্ছে, পুলিশ পরীক্ষার আগের রাতেই (১৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার) অমর একুশে হল থেকে ছাত্রলীগের আবদুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার করে। অমর একুশে হলের একজন হাউস টিউটরও ওই গ্রেপ্তারের সময় উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ আল মামুনের মুঠোফোনে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। ওই রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের আরেক হোতা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক মহিউদ্দিন রানাকে পুলিশ শহীদুল্লাহ হল থেকে আটক করে। রিমান্ডে তাঁরা আরও অনেক তথ্যই দিয়েছেন বলে পুলিশের সূত্রগুলো জানিয়েছে। ছাত্রলীগ অবশ্য মহিউদ্দিনকে তড়িৎগতিতে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে কিছুটা শুদ্ধ হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সেটুকু নীতিবোধও কাজ করেনি।

স্বায়ত্তশাসিত কিন্তু সরকারি অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল (পাবলিক) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহটা অনেক বেশি। ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে না গেলে এবং হাতে গোনা দু-তিনটি ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিলে দেশের ভেতরে এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাপটা তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কখনো কখনো আসনপ্রতি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অনুপাত ষাটও ছাড়িয়ে যায়। এ রকম উচ্চ চাহিদার কারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ঢুকে পড়া মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। অর্থনীতির নিয়ম বলে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকলে একটা কালোবাজার অথবা দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিব্যবস্থাও এখন সেই চক্রের আবর্তে নিপতিত।

সমস্যাটি মোকাবিলা এবং ভর্তিব্যবস্থাকে নিষ্কলুষ করার স্বার্থে শিক্ষাবিদদের অনেকেই কয়েক বছর ধরে গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব করে আসছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত একটি পরীক্ষার মাধ্যমেই সব মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী বাছাই হচ্ছে। আবার স্কুল থেকে কলেজে উত্তরণের সময় এখন ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টি উঠিয়েই দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর এবং ছাত্রছাত্রীর আবাসিক এলাকার নৈকট্য বিচার করে তাদের জন্য কলেজ নির্ধারিত হচ্ছে। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে তাই এখন আর ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের বাড়তি খরচ এবং জেলায় জেলায় সফরের ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কেন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে না? বিশ্বের অনেক দেশেই এ রকম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রী বাছাইয়ের কাজটি হয়ে থাকে। অভিযোগ আছে, ভর্তির মৌসুম আসলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের বাড়তি আয়ের একটি মওকা। আর সে কারণেই তাঁরা কোনো সমন্বিত একক বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় ছাত্রছাত্রী বাছাইয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান না।

আমাদের পুরো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্ন ফাঁস, খাতা জালিয়াতি, নকল করার যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা বন্ধের উদ্যোগ নেবে কে? শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা নেবে, সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু রাজনৈতিক আনুগত্য এবং ক্ষমতালিপ্সা ভর করায় সেই ভরসার জায়গাও আমরা হারাতে বসেছি। শিক্ষাঙ্গনের দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কাজে তাই এখন সোচ্চার হতে হবে সবাইকে।